দৈনিক আমাদের সময়
তারিখ ...17. SEP. 2017... পৃষ্ঠা ...4... কলাম ...

শিক্ষা দিবস

শুধু ধনিকশ্রেণির জন্য উচ্চশিক্ষা নয়

অধ্যাপক ড. এমএ মাননান

আজ থেকে সাড়ে পাঁচ দশক আগে ১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ তাদের নিজস্ব দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য রাস্তায় নামে। পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরাচার আইয়ুব খান ওই আন্দোলনকে দমন-পীড়নের মাধ্যমে স্তব্ধ করতে উদ্যত হয়। চলে পুলিশের গুলি, টিয়ার গ্যাস ও লাঠিচার্জ। রঞ্জিত হয় ঢাকার রাজপথ। শহীদ হন বাবুল, গোলাম মোস্তফা ও ওয়াজিউল্লাহ। ছাত্রসমাজ ১৭ সেপ্টেম্বর তারিখটিকে 'শিক্ষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় আসে '৬৪-এর ছাত্র আন্দোলন, '৬৬-এর ছয় দফা আন্দোলন, '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান ও '৭১-এ মহান মুক্তিযুদ্ধ। আমি শিক্ষা দিবসের শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছি এবং তাদের স্বপ্নসাধ বাস্তবায়নের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি। স্বাধীন স্বদেশে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার লক্ষ শহীদের স্বপ্নসাধ বাস্তবায়নে শিক্ষাকে সহজলভ্য ও সর্বজনীন করার জন্য গণমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন। ড. কুদরত-এ-খুদার শিক্ষানীতি নামে তা ব্যাপক গণসমর্থন লাভ করে। দ্রুতই শুরু হয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী নবজাত বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সাজিয়ে তোলার কর্মযজ্ঞ। স্বাধীনতার সাড়ে পাঁচ দশক পর আমরা '৬২-এর আন্দোলনের স্বাদ পাচ্ছি। কিন্তু এর পেছনের ইতিহাসটা বিভীষিকাময়, নানা চড়াই-উতরাই আর কণ্টকময়।

লৌহমানব হিসেবে কুখ্যাত স্বৈরশাসক আইয়ুব খান, ক্ষমতা দখলের মাত্র দুই মাস পর ১৯৫৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এ কমিশন ১৯৫৯ সালের আগস্টের মধ্যে একটি শিক্ষা রিপোর্ট প্রণয়ন করে। ২৭ অধ্যায়ে বিভক্ত এ রিপোর্টে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত সাধারণ, পেশামূলক শিক্ষা, শিক্ষক প্রসঙ্গ, শিক্ষার মাধ্যম, পাঠ্যপুস্তক, হরফ সমস্যা, প্রশাসন, অর্থ বরাদ্দ, শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যবিষয়ক বিস্তারিত সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়। এতে আইয়ুবশাহির ধর্মান্ধ, পুঁজিবাদী, রক্ষণশীল, সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষাসংকোচন নীতির পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছিল। আইয়ুব সরকার এ রিপোর্টের সুপারিশ গ্রহণ করে তা ১৯৬২ সাল থেকে বাস্তবায়ন করতে শুরু করে।

শরিফ কমিশনের শিক্ষাসংকোচন নীতিকাঠামোয় শিক্ষাকে তিন স্তরে ভাগ করা হয়– প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর। পাঁচ বছরের প্রাথমিক ও তিন বছরের উচ্চতর ডিগ্রি কোর্স এবং দুই বছরের স্নাতকোত্তর কোর্সের ব্যবস্থা থাকবে বলে প্রস্তাব করা হয়। উচ্চশিক্ষা ধনিকশ্রেণির জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ জন্য পাস নম্বর ধরা হয় শতকরা ৫০, দ্বিতীয় বিভাগ শতকরা ৬০ ও প্রথম বিভাগ শতকরা ৭০ নম্বর। এ কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে পূর্ণ সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজে রাজনীতি নিষিদ্ধ করা, ছাত্র-শিক্ষকদের কার্যকলাপের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখার প্রস্তাব করে। শিক্ষকদের কঠোর পরিশ্রম করানোর জন্য ১৫ ঘণ্টা কাজের বিধান রাখা হয়েছিল। শিক্ষকরা যাতে ছাত্রদের সঙ্গে স্বদেশ, স্বজাতি নিয়ে আলোচনা ও তর্কের সুযোগ না পায় সে অপচেষ্টা করা হয়েছিল। শুধু ক্লাসের মাঝে এক ধ্যানে মনোনিবিষ্ট রেখে তারা রোবোটিক শিক্ষক তৈরির চক্রান্ত করেছিল। রিপোর্টের শেষাংশে বর্ণমালা সংস্কার করা এবং বাংলা ও উর্দুর স্থলে রোমান বর্ণমালা প্রয়োগ এবং প্রতিষ্ঠার জন্য কমিটি গঠনের প্রস্তাব করে এই কমিশন। আইয়ুব খান সরকারের শরিফ কমিশন রিপোর্টে শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে বর্ণনা করা হয় : 'শিক্ষা সম্পর্কে জনসাধারণের চিরাচরিত ধারণা অবশ্যই বদলাইতে হইবে। সস্তায় শিক্ষা লাভ করা যায় বলিয়া তাহাদের যে ভুল ধারণা রহিয়াছে, তাহা শীঘ্রই ত্যাগ করিতে হইবে। যেমন দাম তেমন জিনিস, এই অর্থনৈতিক সত্যকে অন্যান্য ব্যাপারে যেমন, শিক্ষার ব্যাপারেও তেমনি এড়ানো দুষ্কর।' পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষাই শিক্ষার লক্ষ্য, তা রিপোর্টের এ অংশে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল।

১৯৬২ সালের ২৫ জুন দেশের নয়জন বিশিষ্ট নাগরিক এক বিবৃতিতে আইয়ুব ঘোষিত শাসনব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করে নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবি জানান। নেতারা সারা দেশে জনসভা করেন, ফলে জনমনে কিছুটা আশার সঞ্চার হয়। '৬২-এর দ্বিতীয়ার্ধে সরকার ঘোষিত শিক্ষানীতির প্রতিবাদে আন্দোলন আবার বেগবান হয়ে ওঠে।

প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ঢাকা কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল স্কুল, ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটসহ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজ নিজ দাবির ভিত্তিতে জুলাই-আগস্টজুড়ে আন্দোলন চলতে থাকে। আন্দোলনের দাবিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল শিক্ষানীতিতে প্রস্তাবিত তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স ও উচ্চ মাধ্যমিক ইংরেজির অতিরিক্ত বোঝা বাতিল করার বিষয়টি। এই দাবির সমর্থনে দেশের প্রায় অধিকাংশ স্কুল-কলেজের ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্লাস বর্জন করতে থাকেন। এসব আন্দোলন কর্মসূচিকে সংগঠিতভাবে রূপ দেওয়ার জন্য ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন পাকিস্তান স্টুডেন্ট ফোরাম নামে সাধারণ ছাত্রদের একটি মোর্চা গঠন করে।

দানবের পরাজয় ও মানবের বিজয় ইতিহাস নির্ধারিত। এর পর '৬৬-এর ছয় দফা, '৬৯-এর গণ-আন্দোলন, এর পর '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ– সব একই সূত্রে গাঁথা। পরবর্তী সময়ে ১৯৯১ সালে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন এবং এর পর গ্রেনেড, বোমা ও জঙ্গিবিরোধী লড়াইয়ে '৬২-এর চেতনা উজ্জীবিত করেছে দেশবাসীকে। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের ভেতর দিয়ে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঘুরে দাঁড়ায় দেশ। রাষ্ট্র ও সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রের মতো শিক্ষাক্ষেত্রও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারায় সুসংগঠিত হয়ে উঠতে থাকে। ২০১০ সালে প্রণীত হয় গণমুখী শিক্ষানীতি এবং সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় এই নীতি বাস্তবায়নের কাজ। প্রথমবারের মতো শিক্ষা আইনও আলোর মুখ দেখার পথে। বর্তমানে বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের বছর শুরুর দিনে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, আধুনিক যুগোপযোগী ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে সিলেবাস প্রণয়ন, ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান, শিক্ষাসহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন, শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন, কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন, ডায়নামিক ওয়েবসাইট প্রতিষ্ঠা, শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, কোচিং বাণিজ্য বন্ধে কঠোরতা, কারিগরি শিক্ষার প্রসার, মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিকায়ন, উচ্চশিক্ষার প্রসার ও গুণগত মান বৃদ্ধি, জেন্ডার সমতা, ইউনেস্কোর সদস্যপদ লাভ, শিক্ষার অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে প্রণীত শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের কাজ অগ্রসর হচ্ছে। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্যের ধারা হয়েছে অবারিত। দেখছি আমরা সাফল্যের সোপানে ঊর্ধ্বগমন।

উন্নত ও মানুষের মতো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার মতো শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চলছে, চলবে এবং এটা চলমান প্রক্রিয়া। উন্নত আধুনিক ও গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শেখ হাসিনা সরকার ছিল; এখনো আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। মহান শিক্ষা দিবসের মাস সেপ্টেম্বরে আমাদের শপথ শহীদদের স্বপ্নসাধ আমরা বৃথা যেতে দেব না।

❑ অধ্যাপক ড. এমএ মাননান : শিক্ষাবিদ ও কলাম লেখক